سورة محمد

# সূরা মুহাম্মদ

**মদীনায় অবতীর্ণ, ৩৮ আয়াত, ৪ রুকূ**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝١ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝٢ ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ۝٣

**পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহ্‌র নামে।**

**(১) যারা কুফর করে এবং আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে, আল্লাহ্ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন। (২) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন। (৩) এটা এ কারণে যে, যারা কাফির, তারা বাতিলের অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী, তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে। এমনিভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।**

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

যারা ( নিজেরাও ) কুফর করে এবং ( অপরকেও ) আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে, ( যেমন কাফির সরদারদের অবস্থা ছিল, তারা ইসলামের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করার জন্য জান ও মাল সবকিছু দ্বারা প্রচেষ্টা চালাত ), আল্লাহ্ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেন। ( অর্থাৎ যেসব কর্মকে তারা ফলপ্রসূ মনে করে, ঈমান না থাকার কারণে সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়, বরং উহার মধ্যে কিছু কিছু কর্ম উল্টা তাদের শাস্তির কারণ হবে ; যেমন, আল্লাহ্‌র পথে

বাধা সৃষ্টি করার কাজে অর্থকড়ি ব্যয় করা। আল্লাহ্ বলেনঃ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً الخ পক্ষান্তরে) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং (তাদের বিশ্বাসের বিবরণ এই যে) তারা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (সা) -এর প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, (যা মেনে চলাও জরুরী)। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গোনাহ্সমূহ মার্জনা করবেন এবং (উভয় জাহানে) তাদের অবস্থা ভাল রাখবেন (ইহকালে এভাবে যে, তাদের সৎকর্ম করার তওফীক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং পরকালে এভাবে যে, তারা আযাব থেকে মুক্তি এবং জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে)। এটা (অর্থাৎ মু'মিনদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কাফিরদের দুর্গতি) এ কারণে যে, কাফিররা ভ্রান্ত পথের অনুসরণ করে এবং ঈমানদাররা শুদ্ধ পথের অনুসরণ করে; যা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। (ভ্রান্ত পথের পরিণাম যে ব্যর্থতা এবং শুদ্ধ পথের পরিণাম যে সাফল্য, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাই কাফিররা ব্যর্থ মনোরথ হবে এবং মু'মিনগণ সফলকাম হবেন। ইসলাম যে শুদ্ধপথ, এ সম্পর্কে সন্দেহ হলে مِن رَّبِّهِمْ বলে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রমাণ এই যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত। পয়গম্বরের মো'জেযাসমূহ বিশেষ করে কোরআনের অলৌকিকতা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত)। আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে (অর্থাৎ উপরোক্ত অবস্থা বর্ণনা করার মতই) মানুষের (উপকার ও হিদায়তের) জন্য তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন, (যাতে উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন—উভয় পন্থায় তাদেরকে হিদায়ত করা যায়)।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

সূরা মুহাম্মদের অপর নাম সূরা কিতালও। কেননা, এতে 'কিতাল' তথা জিহাদের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। এমনকি, এর একটি আয়াত كَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এটি মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত। কেননা, এই আয়াতটি তখন নাযিল হয়েছিল, যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়েছিলেন এবং মক্কার জনবসতি ও বায়তুল্লাহ্র দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছিলেনঃ হে মক্কা নগরী, জগতের সমস্ত নগরের মধ্যে তুমিই আমার কাছে প্রিয়। যদি মক্কার অধিবাসীরা আমাকে এখান থেকে বহিষ্কার না করত, তবে আমি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কখনও তোমাকে ত্যাগ করতাম না। তফসীরবিদগণের পরিভাষায় যে আয়াত হিজরতের সফরে অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত গণ্য করা হয়। মোটকথা এই যে, এই সূরা মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং মদীনায় পৌঁছেই কাফিরদের সাথে জিহাদ ও যুদ্ধের বিধানাবলী নাযিল হয়েছে।

صَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ—এখানে سَبِيْلِ اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র পথ) বলে ইসলামকে বোঝানো হয়েছে। أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ বলে কাফিরদের ঐ সকল কর্ম বোঝানো হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে সৎ কর্ম, যেমন ফকীর-মিসকীনকে সাহায্য ও সহায়তা করা, প্রতিবেশীর সমর্থন ও হিফাযত করা, দানশীলতা, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এসব কর্ম যদিও প্রকৃতপক্ষে সৎকর্ম, কিন্তু ঈমানসহ হলেই পরকালে এগুলো দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। কাফিরদের এ ধরনের সৎ কর্ম পরকালে তাদের জন্য মোটেই উপকারী হবে না। তবে তাদের সৎ কর্মের বিনিময়ে ইহকালেই তাদেরকে আরাম ও সুখ দান করা হয়।

وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ—যদিও পূর্ববর্তী বাক্যেও ঈমান ও সৎ কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র রিসালত ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীও শামিল রয়েছে, কিন্তু এই দ্বিতীয় বাক্যে একথা স্পষ্টভাবে পুনরুল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই সত্য ব্যক্ত করা যে, শেষনবী মুহাম্মদ (সা)-এর সমস্ত শিক্ষা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করার উপরই ঈমানের আসল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ—بَال শব্দটি কখনও অবস্থার অর্থে এবং কখনও অন্তরের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থ নেওয়া যায়। প্রথম অর্থে আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অবস্থাকে অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কর্মকে ভাল করে দেন। দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরকে ঠিক করে দেন। এর সারমর্মও সমস্ত কাজকর্ম ঠিক করে দেওয়া। কেননা, কাজকর্ম ঠিক করে দেওয়া অন্তর ঠিক করে দেওয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

**(৪) অতঃপর যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দান মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সংবরণ করবে।**

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

(পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, মু'মিনরা সংস্কারকামী এবং কাফিররা অনর্থকামী। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কুফর ও কাফিরদের অনর্থ দূর করার জন্য আলোচ্য আয়াতে জিহাদের বিধানাবলী আলোচিত হয়েছে)। অতঃপর যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর, তখন তাদের গর্দান মার, অবশেষে যখন তাদের খুব রক্তপাত ঘটিয়ে নাও, (এর অর্থ কাফিরদের শৌর্যবীর্য নিঃশেষ হয়ে যাওয়া এবং যুদ্ধ বন্ধ করা হলে মুসলমানদের ক্ষতি অথবা কাফিরদের প্রবল হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকা) তখন (কাফিরদেরকে বন্দী করে) খুব শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর (তোমরা উভয় কাজ করতে পার) হয় তাদেরকে মুক্তিপণ না নিয়ে মুক্ত করে দেবে, না হয় মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেবে। (এই যুদ্ধ ও বন্দী করার নির্দেশ তখন পর্যন্ত) যে পর্যন্ত না (শত্রু) যোদ্ধারা অস্ত্র সংবরণ করে। (অর্থাৎ হয় তারা ইসলাম কবূল করবে, না হয় মুসলমানদের যিম্মী হয়ে বসবাস করতে রাযী হবে। এরূপ করলে যুদ্ধ ও বন্দী কোন কিছুই করা জায়েয হবে না)।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

আলোচ্য আয়াত থেকে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়। এক. যুদ্ধের মাধ্যমে কাফিরদের শৌর্যবীর্য নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদেরকে হত্যার পরিবর্তে বন্দী করতে হবে। দুই. অতঃপর এই যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলমানদেরকে দু'রকম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রথমত কৃপাবশে তাদেরকে কোন রকম মুক্তিপণ ও বিনিময় ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেওয়া। দ্বিতীয়ত মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। মুক্তিপণ এরূপও হতে পারে যে, আমাদের কিছু-সংখ্যক মুসলমান তাদের হাতে বন্দী থাকলে তাদের বিনিময়ে কাফির বন্দীদেরকে মুক্ত করা এবং এরূপও হতে পারে যে, কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। এই বিধান পূর্ব-বর্ণিত সূরা আনফালের বিধানের বাহ্যত খেলাফ। সূরা আনফালে বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শাস্তিবাণী অবতীর্ণ হয়েছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেনঃ আমাদের এই সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল---যদি এই আযাব আসত, তবে ওমর ইবনে খাত্তাব ও সা'দ ইবনে মুয়ায (রা) ব্যতীত কেউ তা থেকে রক্ষা পেত না। কেননা, তারা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআনের চতুর্থ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সার কথা এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদরের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়াও নিষিদ্ধ করেছিল। কাজেই মুক্তি-পণ ব্যতিরেকে ছেড়ে দেওয়া আরও উত্তমরূপে নিষিদ্ধ ছিল। সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত এই উভয় বিষয়কে সিদ্ধ সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই অধিকাংশ সাহাবী ও ফিক্‌হবিদ বলেন যে, সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। তফসীরে মাযহারীতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), হাসান, আতা (র), অধিকাংশ সাহাবী ও ফিক্‌হবিদের উক্তি তাই। সওরী, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক (র) প্রমুখ ফিক্‌হবিদ ইমামের মাযহাবও তাই। হযরত ইবনে

আব্বাস (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল। তখন কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন মুসলমানদের শৌর্যবীর্য ও সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন সূরা মুহাম্মদে কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেওয়ার অনুমতি দান করা হয়। তফসীরে মাযহারীতে কাযী সানাউল্লাহ্ এ কথাটি উদ্ধৃত করার পর বলেন, এ উক্তিই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয়। কেননা, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) একে কার্যে পরিণত করেছেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনও একে কার্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। তাই এই আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। কারণ এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদর যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়। বদর যুদ্ধ হিজরতের দ্বিতীয় সালে সংঘটিত হয়েছিল। আর রসূলুল্লাহ্ (সা) ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী বন্দীদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে মুক্ত করেছিলেন।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার মক্কার আশি জন কাফির রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অতর্কিতে হত্যা করার ইচ্ছা নিয়ে তানয়ীম পাহাড় থেকে নিচে অবতরণ করে। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে জীবিত গ্রেফতার করেন এবং মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ফাতহের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ○

এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-র প্রসিদ্ধ মাযহাব এই যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেওয়া জায়েয নয়। এ কারণেই হানাফী আলিমগণ সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াতকে ইমাম আযমের মতে রহিত ও সূরা আনফালের আয়াতকে রহিতকারী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তফসীরে মাযহারী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, সূরা আনফালের আয়াত পূর্বে এবং সূরা মুহাম্মদের আয়াত পরে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই সূরা মুহাম্মদের আয়াতই রহিতকারী এবং সূরা আনফালের আয়াত রহিত। ইমাম আযমের পছন্দনীয় মাযহাবও অধিকাংশ সাহাবী ও ফিক্হবিদের অনুরূপ মুক্ত করা জায়েয বলে তফসীরে মাযহারী বর্ণনা করেছে। যদি এতেই মুসলমানদের উপকারিতা নিহিত থাকে, তফসীরে মাযহারীর মতে এটাই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয় মাযহাব। হানাফী আলিমগণের মধ্যে আল্লামা ইবনে হুমাম (র) 'ফতহুল কাদীর' গ্রন্থে এই মাযহাবই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেন ঃ কুদূরী ও হিদায়ার বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আযমের মতে বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করা যায় না। এটা ইমাম আযম থেকে বর্ণিত এক রিওয়ায়েত। কিন্তু তাঁর কাছ থেকেই অপর এক রিওয়ায়েত 'সিয়ারে কবীরে' জমহুরের উক্তির অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, মুক্ত করা জায়েয। উভয় রিওয়ায়েতের মধ্যে শেষোক্ত রিওয়ায়েতই অধিক স্পষ্ট। ইমাম তাহাভী (র) 'মা-'আনিউল আসারে' একেই ইমাম আযমের মাযহাব সাব্যস্ত করেছেন।

সারকথা এই যে, সূরা মুহাম্মদ ও সূরা আনফালের উভয় আয়াত অধিকাংশ সাহাবী ও ফিক্‌হবিদের মতে রহিত নয়। মুসলমানদের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মুসলমানদের শাসনকর্তা এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একটিকে উপযুক্ত মনে করবে, সেটিই প্রয়োগ করতে পারবে। কুরতুবী রসূলুল্লাহ্ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্ম-পন্থা দ্বারা প্রমাণিত করেছেন যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে কখনও হত্যা করা হয়েছে, কখনও গোলাম করা হয়েছে, কখনও মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং কখনও মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ে মুসলমান বন্দীদেরকে মুক্ত করানো এবং কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেওয়া এই উভয় ব্যবস্থাই মুক্তিপণ নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপন্থা দ্বারা উভয় ব্যবস্থাই প্রমাণিত আছে। এই বক্তব্য পেশ করার পর ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, এ থেকে জানা যায় যে, এ ব্যাপারে যে সব আয়াতকে রহিতকারী ও রহিত বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো তদ্রূপ নয় ; বরং সবগুলো অকাট্য আয়াত। কোন আয়াতই রহিত নয়। কেননা, কাফিররা যখন বন্দী হয়ে আমাদের হাতে আসবে, তখন মুসলিম শাসনকর্তা চারটি ধারার মধ্য থেকে যে কোনটি প্রয়োগ করতে পারবেন। তিনি উপযুক্ত মনে করলে বন্দীদেরকে হত্যা করবেন, উপযুক্ত বিবেচনা করলে তাদেরকে গোলাম ও বাঁদী করে নেবেন, মুক্তিপণ নেওয়া উপযুক্ত মনে করলে অর্থকড়ি নিয়ে অথবা মুসলমান বন্দীদের বিনিময়ে ছেড়ে দেবেন অথবা কোন-রূপ মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেবেন। এরপর কুরতুবী লিখেন ঃ

وهذا القول يروى من اهل المدينة والشافعى وابى عبيد
وحكاه الطحاوى مذهبا عن ابى حنيفة والمشهور ما قدمناه -

অর্থাৎ মদীনার আলিমগণ তাই বলেন এবং এটাই ইমাম শাফেয়ী ও আবূ ওবায়েদ (র)-এর উক্তি। ইমাম তাহাভী, ইমাম আবূ হানীফা (র)-ও এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর প্রসিদ্ধ মাযহাব এর বিপক্ষে।

**যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলিম শাসনকর্তার চারটি ক্ষমতা ঃ** উপরোক্ত বক্তব্য থেকে ফুটে উঠেছে যে, মুসলিম শাসনকর্তা যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করতে পারবেন এবং তাদেরকে গোলাম বানাতে পারবেন। এই প্রশ্নে উম্মতের সবাই একমত। মুক্তিপণ নিয়ে অথবা মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে যদিও কিছু মতভেদ আছে, কিন্তু অধিকাংশের মতে এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ।

**ইসলামে দাসত্বের আলোচনা ঃ** এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে তো ফিক্‌হবিদগণের মধ্যে কিছু না কিছু মতভেদ আছে। কিন্তু হত্যা করা ও গোলাম বানানোর বৈধতার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। এ ক্ষেত্রে সবাই একমত যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করা উভয় ব্যবস্থাই জায়েয। এমতাবস্থায় কোরআন পাকে এই ব্যবস্থাদ্বয়ের উল্লেখ করা হয়নি কেন ? শুধু মুক্ত করে দেওয়ার দুই ব্যবস্থাই কেন উল্লেখ করা হল ? ইমাম রাযী (র) তফসীরে কবীরে এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এখানে কেবল এমন দুইটি ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে, যা সর্বত্র ও সর্বদা বৈধ। দাসে পরিণত

করার কথা উল্লেখ না করার কারণ এই যে, আরবের যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি নেই এবং পঙ্গু ইত্যাদি লোকের হত্যাও জায়েয নয়। এতদ্ব্যতীত হত্যার কথা পূর্বে উল্লেখও করা হয়েছে।---( তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০৮ )

দ্বিতীয় কথা এই যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করার বৈধতা সুবিদিত ও সুপরিজ্ঞাত ছিল। সবাই জানত যে, এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ। এর বিপরীতে মুক্ত করে দেওয়ার বিষয়টি বদর যুদ্ধের সময় রহিত করে দেওয়া হয়েছিল। এখন এস্থলে মুক্ত ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দান করাই উদ্দেশ্য ছিল। তাই এরই দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুক্তিপণ ব্যতিরেকে ছেড়ে দেওয়া এবং মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া। যেসব ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই বৈধ ছিল সেগুলোকে এস্থলে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কাজেই এসব আয়াতদৃষ্টে একথা বলা কিছুতেই ঠিক নয় যে, এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হত্যা অথবা দাসে পরিণত করার বিধান রহিত হয়ে গেছে। যদি দাসে পরিণত করার বিধান রহিতই হয়ে যেত, তবে কোরআন ও হাদীসের এক না এক জায়গায় এর নিষেধাজ্ঞা উল্লিখিত হত। যদি আলোচ্য আয়াতই নিষেধাজ্ঞার স্থলাভিষিক্ত হত তবে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর পর কোরআন ও হাদীসের অকৃত্রিম ভক্ত সাহাবায়ে কিরাম অসংখ্য যুদ্ধবন্দীদের কেন দাসে পরিণত করেছেন? হাদীস ও ইতিহাসে দাসে পরিণত করার কথা এত অধিক পরিমাণে ও পরম্পরা সহকারে বর্ণিত হয়েছে যে, তা অস্বীকার করা ধৃষ্টতা বৈ কিছুই নয়।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, ইসলাম মানবাধিকারের সর্ববৃহৎ সংরক্ষক হয়ে দাসত্বের অনুমতি কিরূপে দিল? প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বৈধকৃত দাসত্বকে জগতে অন্যান্য ধর্ম ও জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করে নেওয়ার কারণেই এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অথচ ইসলাম দাসদেরকে যেসব অধিকার দান করেছে এবং সমাজে তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে এরপর তারা কেবল নামেই দাস রয়ে গেছে। নতুবা তারা প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে। বিষয়টির স্বরূপ ও প্রাণ দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলে দেখা যায় যে, অনেক অবস্থায় যুদ্ধবন্দীদের সাথে এর চাইতে উত্তম ব্যবহার সম্ভবপর নয়। পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ মসিও গোস্তাও লিবান তদীয় 'আরবের তমদ্দুন' গ্রন্থে লিখেন ঃ

"বিগত ত্রিশ বছর সময়ের মধ্যে লিখিত আমেরিকান ঐতিহ্য পাঠে অভ্যস্ত কোন ইউরোপীয় ব্যক্তির সামনে যদি 'দাস' শব্দটি উচ্চারণ করা হয় তবে তার মানসপটে এমন মিসকীনদের চিত্র ভেসে উঠে, যাদেরকে শিকল দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে, গলায় বেড়ী পরানো হয়েছে এবং বেত মেরে মেরে হাঁকানো হচ্ছে। তাদের খোরাক প্রাণটা কোনরূপ দেহে আটকে রাখার জন্যও যথেষ্ট নয়। বসবাসের জন্য অন্ধকারময় কক্ষ ছাড়া তারা আর কিছুই পায় না। আমি এখানে এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না যে, এই চিত্র কতটুকু সঠিক এবং ইংরেজরা কয়েক বছরের মধ্যে আমেরিকায় যা কিছু করেছে তা এই চিত্রের অনুরূপ কি না।' --- কিন্তু এটা নিশ্চিত সত্য যে, মুসলমানদের কাছে দাসের যে চিত্র তা খৃস্টানদের চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ( ফরীদ ওয়াজদী প্রণীত দায়েরা মা'আরেফুল কোরআন থেকে উদ্ধৃত। ( ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৯ )

প্রকৃত সত্য এই যে, অনেক অবস্থায় বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার চাইতে উত্তম কোন পথ থাকে না। কেননা দাসে পরিণত না করা হলে যৌক্তিক দিক দিয়ে তিন অবস্থাই সম্ভবপর—হয় হত্যা করা হবে, না হয় মুক্ত ছেড়ে দেওয়া হবে, না হয় যাবজ্জীবন বন্দী করে রাখা হবে। প্রায়ই এই তিন অবস্থা উপযোগিতার পরিপন্থী হয়। কোন কোন বন্দী উৎকৃষ্ট প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে, এ কারণে হত্যা করা সমীচীন হয় না। মুক্ত ছেড়ে দিলে মাঝে মাঝে এমন আশংকা থাকে যে, স্বদেশে পৌঁছে সে মুসলমানদের জন্য পুনরায় বিপদ হয়ে যাবে। এখন দুই অবস্থাই অবশিষ্ট থাকে—হয় তাকে যাবজ্জীবন বন্দী রেখে আজকালকার মত কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আটক রাখা, না হয় তাকে দাসে পরিণত করে তার প্রতিভাকে কাজে লাগানো এবং তার মানবাধিকারের পুরোপুরি দেখা-শোনা করা। চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, এতদুভয়ের মধ্যে উত্তম ব্যবস্থা কোন্‌টি? বিশেষত দাসদের সম্পর্কে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বোঝা আরও সহজ। দাসদের সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে রসূলে করীম (সা) নিম্নরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন ঃ

اخوا نكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يديه فليطعمه ما يا كل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فان كلفه يغلبه فليعنه-

তোমাদের দাসরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব যার ভাই তার অধীনস্থ হয় সে যেন তাকে তাই খাওয়ায়, যা সে নিজে খায়, তাই পরিধান করায়, যা সে নিজে পরিধান করে এবং তাকে যেন এমন কাজের ভার না দেয়, যা তার জন্য অসহনীয়। যদি এমন কাজের ভার দেয়, তবে যেন সে তাকে সাহায্য করে।---(বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দিক দিয়ে ইসলাম দাসদেরকে যে মর্যাদা দান করেছে তা স্বাধীন ও মুক্ত মানুষের মর্যাদার প্রায় কাছাকাছি। সেমতে অন্যান্য জাতির বিপরীতে ইসলাম দাসদেরকে শুধু বিবাহ করার অনুমতিই দেয়নি ; বরং প্রভুদেরকে أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ আয়াতের মাধ্যমে জোর তাকীদও করেছে। এমনকি তারা স্বাধীন ও মুক্ত নারীদেরকেও বিবাহ করতে পারে। যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তাদের অংশ স্বাধীন মুজাহিদের সমান। শত্রুকে প্রাণের নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে তাদের উক্তিও তেমনি ধর্তব্য, যেমন স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের উক্তি। কোরআন ও হাদীসে তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশাবলী এত অধিক বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলোকে একত্রে সন্নিবেশিত করলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক হয়ে যেতে পারে। হযরত আলী (রা) বলেন, দু'জাহানের নেতা হযরত রসূলে মকবুল (সা)-এর পবিত্র মুখে যে বাক্যাবলী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উচ্চারিত হচ্ছিল এবং যারপর তিনি পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান তা ছিল এই ঃ الصَّلٰوةَ الصَّلٰوةَ اتقوا الله فيما ملكت ايما نكم—অর্থাৎ নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখ, নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তোমাদের অধীনস্থ দাসদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর।---(আবু দাউদ)

ইসলাম দাসদেরকে শিক্ষাদীক্ষা অর্জনেরও যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের আমলে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রায় সকল প্রদেশেই জ্ঞান-গরিমায় যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁরা সবাই দাসদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে এই ঘটনা বর্ণিত আছে। এরপর এই নামেমাত্র দাসত্বকেও পর্যায়-ক্রমে বিলীন করা অথবা হ্রাস করার জন্য দাসদেরকে মুক্ত করার ফযীলত কোরআন ও হাদীসে ভূরি ভূরি বর্ণিত হয়েছে, যাতে মনে হয় যেন অন্য কোন সৎকর্ম এর সমকক্ষ হতে পারে না। ফিক্‌হর বিভিন্ন বিধি-বিধানে দাসদেরকে মুক্ত করার জন্য বাহানা তালাশ করা হয়েছে। রোযার কাফ্‌ফারা, হত্যার কাফ্‌ফারা, জিহারের কাফ্‌ফারা ও কসমের কাফ্‌ফারার মধ্যে দাস মুক্ত করাকে সর্বপ্রথম বিধান রাখা হয়েছে। এমনকি হাদীসে একথাও বলা হয়েছে যে, কেউ যদি দাসকে অন্যায়ভাবে চপেটাঘাত করে, তবে এর কাফ্‌ফারা হচ্ছে দাসকে মুক্ত করে দেওয়া।---( মুসলিম ) সাহাবায়ে কিরামের অভ্যাস ছিল তাঁরা অকাতরে প্রচুর সংখ্যক দাস মুক্ত করতেন। 'আন্নাজমুল ওয়াহ্‌হাজ'-এর গ্রন্থকার কোন কোন সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

হযরত আয়েশা (রা)---৬৯, হযরত হাকীম ইবনে হেযাম---১০০, হযরত ওসমান গনী (রা)---২০, হযরত আব্বাস (রা)---৭০, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)---১০০০, হযরত যুল কা'লা হিমইয়ারী (রা)---৮০০০ ( মাত্র এক দিনে ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)---৩০,০০০।---( ফতহুল আল্লাম, টীকা বুলুগুল মারাম, নবাব সিদ্দীক হাসান খান প্রণীত, ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃঃ ) এ থেকে জানা যায় যে, মাত্র সাতজন সাহাবী ৩৯,২৫৯ জন দাসকে মুক্ত করেছেন। বলা বাহুল্য, অন্য আরও হাজারো সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা এর চাইতে অনেক বেশী হবে। মোট কথা ইসলাম দাসত্বের ব্যবস্থায় সর্বব্যাপী সংস্কার সাধন করেছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখবে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, ইসলামের দাসত্বকে অন্যান্য জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এসব সংস্কার সাধনের পর যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি তাদের প্রতি একটি বিরাট অনুগ্রহের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এখানে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার বিধান কেবল বৈধতা পর্যন্ত সীমিত। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র যদি উপযুক্ত বিবেচনা করে, তবে তাদেরকে দাসে পরিণত করতে পারে। এরূপ করা মোস্তাহাব অথবা ওয়াজিব নয়। বরং কোরআন ও হাদীসের সমষ্টিগত বাণী থেকে মুক্ত করাই উত্তম বোঝা যায়। দাসে পরিণত করার এই অনুমতিও ততক্ষণ, যতক্ষণ শত্রুপক্ষের সাথে এর বিপরীত কোন চুক্তি না থাকে। যদি শত্রুপক্ষের সাথে চুক্তি হয়ে যায় যে, তারা আমাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করবে না এবং আমরাও তাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করব না, তবে এই চুক্তি মেনে চলা অপরিহার্য হবে। বর্তমান যুগে বিশ্বের অনেক দেশ এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ আছে। কাজেই যেসব মুসলিম দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে তাদের জন্য চুক্তি বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত কোন বন্দীকে দাসে পরিণত করা বৈধ নয়।

ذٰلِكَ ۛ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُمْ
بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝٤
سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝٥ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝٦
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝٧
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝٨ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا
مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۝٩ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۡ وَلِلْكٰفِرِيْنَ
اَمْثَالُهَا ۝١٠ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ
لَا مَوْلٰى لَهُمْ ۝١١

(৪-ক) একথা শুনলে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে শোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়, আল্লাহ্ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। (৫) তিনি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। (৬) অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। (৭) হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন। (৮) আর যারা কাফির, তাদের জন্য আছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দেবেন। (৯) এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। অতএব, আল্লাহ্ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন। (১০) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি অতঃপর দেখেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং কাফিরদের অবস্থা এরূপই হবে। (১১) এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের হিতৈষী বন্ধু এবং কাফিরদের কোন হিতৈষী বন্ধু নেই।

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

(জিহাদের) এই নির্দেশ (যা বর্ণিত হয়েছে) পালন কর। (কোন কোন অবস্থায় কাফিরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আল্লাহ্ জিহাদ প্রবর্তন করেছেন। এটা

বিশেষ তাৎপর্যের কারণে। নতুবা) আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে (নিজেই নৈসর্গিক ও মর্ত্যের আযাব দ্বারা) তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন (যেমন পূর্ববর্তী উম্মতদের কাছ থেকে এমনি ধরনের প্রতিশোধ নিয়েছেন। কারও উপর প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে, কাউকে ঝড়ঝঞ্ঝা আক্রমণ করেছে এবং কাউকে নিমজ্জিত করা হয়েছে। এরূপ হলে তোমাদেরকে জিহাদ করতে হতো না)। কিন্তু (তোমাদেরকে জিহাদ করার নির্দেশ এই জন্য দিয়েছেন যে) তিনি তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান (মুসলমানদের পরীক্ষা এই যে, কে আল্লাহ্র নির্দেশের বিপরীতে নিজের জীবনকে মূল্যবান মনে করে তা দেখা এবং কাফিরদের পরীক্ষা এই যে, জিহাদ ও হত্যার দৃশ্য দেখে কে হুঁশিয়ার হয়ে কে সত্যকে কবূল করে, তা দেখা। জিহাদে যেমন কাফিরদেরকে হত্যা করা সাফল্য, তেমনি কাফির-দের হাতে নিহত হওয়াও ব্যর্থতা নয়। কেননা) যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কর্মকে (জিহাদের এই কর্মসহ) কখনও বিনষ্ট করবেন না। (বাহ্যত মনে করা যায় যে, যখন তারা কাফিরদের বিপক্ষে জয়লাভ করতে পারল না এবং নিজেরাই নিহত হল, তখন যেন তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেল। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কেননা তাদের কর্মের অপর একটি ফল অর্জিত হয়, যা বাহ্যিক সফলতার চাইতে বহুগুণে উত্তম। তা এই যে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (মনযিলে) মকসূদ পর্যন্ত (যা পরে বর্ণিত হবে) পৌঁছে দেবেন এবং তাদের অবস্থা (কবর, হাশর-পুলসিরাত ও পরকালের সব জায়গায়) ভাল রাখবেন। (কোথাও কোন ক্ষতি ও অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে না) এবং (এই মনযিলে মকসূদ পর্যন্ত পৌঁছা এই যে) তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন যা তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে। (ফলে প্রত্যেক জান্নাতী নিজ নিজ বাসস্থানে কোনরূপ খোঁজাখুঁজি ছাড়াই নির্বিবাদে পৌঁছে যাবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিহাদে বাহ্যিক পরাজয় অর্থাৎ নিজে নিহত হওয়াও বিরাট সাফল্য। অতঃপর জিহাদের পার্থিব উপকারিতা ও ফযীলত বর্ণনা করে তৎপ্রতি উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে ঃ) হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে (অর্থাৎ তার দীন প্রচারে) সাহায্য কর তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন (এর পরিণতি দুনিয়াতেও শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করা—প্রথমেই হোক কিংবা কিছুদিন পর পরিণামে হোক। কোন কোন মু'মিনের নিহত হওয়া কিংবা কোন যুদ্ধে সাময়িক পরাজয় বরণ করা এর পরিপন্থী নয়) এবং (শত্রুর মুকাবিলায়) তোমাদের পা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখবেন—(প্রথমেই হোক কিংবা সাময়িক পরাজয়ের পরে হোক আল্লাহ্ তাদেরকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রেখে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবেন। দুনিয়াতে বারবার এরূপ প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। এ হচ্ছে মুসলমানদের অবস্থার বর্ণনা) আর যারা কাফির তাদের জন্য (দুনিয়াতে মু'মিনদের মুকাবিলা করার সময়) দুর্ভোগ (ও পরাজয়) রয়েছে এবং (পরকালে) তাদের কর্মসমূহকে আল্লাহ্ তা'আলা নিষ্ফল করে দেবেন (যেমন সূরার প্রারম্ভে বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা কাফিররা উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং) এটা (অর্থাৎ কাফিরদের ক্ষতি ও কর্মসমূহের নিষ্ফল হওয়া) এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তা পছন্দ করে না (বিশ্বাস-গতভাবেও এবং কর্মগতভাবেও) অতএব, আল্লাহ্ তাদের কর্মসমূহকে (প্রথম থেকেই) বরবাদ করে দিয়েছেন। (কেননা কুফর সর্বোচ্চ বিদ্রোহ। এর পরিণতি তাই। তারা যে আল্লাহ্র আযাবকে ভয় করে না) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি, অতঃপর দেখেনি যে,

তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন (তাদের জনশূন্য প্রাসাদ ও বাসস্থান দেখেই তা বোঝা যায়। অতএব, তাদের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। তারা কুফর থেকে বিরত না হলে) এ কাফিরদের জন্যও অনুরূপ শাস্তি রয়েছে। (অতঃপর উভয় পক্ষের অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে)। এটা (অর্থাৎ মুসলমানদের সাফল্য ও কাফিরদের ধ্বংস) এ কারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের অভিভাবক এবং কাফিরদের (এরূপ) কোন অভিভাবক নেই (যে আল্লাহ্র মুকাবিলায় তাদের কার্যোদ্ধার করতে পারে। ফলে তারা উভয় জাহানে অকৃতকার্য থাকে। মুসলমানরা কোন সময় দুনিয়াতে সাময়িকভাবে ব্যর্থ হলেও পরিণামে সফল হবে। পরকালের সফল তো সুস্পষ্টই। অতএব, মুসলমান সর্বদা সফলকাম এবং কাফির সর্বদা ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে থাকে)।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

**জিহাদ সিদ্ধ হওয়ার একটি রহস্য :** وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জিহাদের সিদ্ধতা প্রকৃতপক্ষে একটি রহমত। কেননা জিহাদকে আসমানী আযাবের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ কুফর, শিরক ও আল্লাহ্-দ্রোহিতার শাস্তি পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে আসমান ও যমীনের আযাব দ্বারা দেওয়া হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেও এরূপ হতে পারত, কিন্তু রাহ্মাতুল্লিল আলামীনের কল্যাণে এই উম্মতকে এ ধরনের আযাব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং এর স্থলে জিহাদ সিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যাপক আযাবের তুলনায় অনেক নমনীয়তা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। প্রথম এই যে, ব্যাপক আযাবে নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সমগ্র জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে জিহাদে নারী ও শিশুরা তো নিরাপদ থাকেই, পরন্তু পুরুষও তারাই আক্রান্ত হয়, যারা আল্লাহ্র ধর্মের হিফাযতকারীদের মুকাবিলায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করে। তাদের মধ্যেও সবাই নিহত হয় না; বরং অনেকের ইসলাম ও ঈমানের তওফীক হয়ে যায়। জিহাদের দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, এর মাধ্যমে উভয় পক্ষের অর্থাৎ মুসলমান ও কাফিরের পরীক্ষা হয়ে যায় যে, কে আল্লাহ্র নির্দেশে নিজের জান ও মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয় এবং কে অবাধ্যতা ও কুফরে অটল থাকে কিংবা ইসলামের উজ্জ্বল প্রমাণাদি দেখে ইসলাম কবুল করে।

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ —সূরার প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে, যারা কুফর ও শিরক করে এবং অপরকেও ইসলাম থেকে বিরত রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দেবেন; অর্থাৎ তারা যেসব সদকা-খয়রাত ও জনহিতকর কাজ করে, শিরক ও কুফরের কারণে সেগুলোর কোন সওয়াব তারা পাবে না। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্র পথে শহীদ হয় তাঁদের কর্ম বিনষ্ট হয় না; অর্থাৎ তারা কিছু গোনাহ্ করলেও সেই গোনাহের কারণে তাদের সৎকর্ম হ্রাস পায় না। বরং অনেক সময় তাদের সৎকর্ম তাদের গোনাহ্র কাফফারা হয়ে যায়।

سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ এতে শহীদের দু'টি নিয়ামত বর্ণিত হয়েছে। এক. আল্লাহ্ তাকে হিদায়ত করবেন, দুই. তার সমস্ত অবস্থা ভাল করে দেবেন। অবস্থা বলতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের অবস্থা বোঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে এই যে, যে ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করে, সে শহীদ না হলেও শহীদের সওয়াবের অধিকারী হবে। আখিরাতে এই যে, সে কবরের আযাব থেকে এবং হাশরের পেরেশানী থেকে মুক্তি পাবে। কিছু লোকের হক তার যিম্মায় থেকে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা হকদারদেরকে তার প্রতি রাযী করিয়ে তাকে মুক্ত করে দেবেন। (মাযহারী) শহীদ হওয়ার পর হিদায়ত করার অর্থ এই যে, তাদেরকে 'মনযিলে মকসূদ' অর্থাৎ জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবেন ; যেমন কোরআনে জান্নাতীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতে পৌঁছে একথা বলবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰانَا لِهٰذَا

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ—এ হচ্ছে একটি তৃতীয় নিয়ামত। অর্থাৎ তাদেরকে কেবল জান্নাতেই পৌঁছানো হবে না ; বরং তাদের অন্তরে আপনা-আপনি জান্নাতে নিজ নিজ স্থান ও জান্নাতের নিয়ামত তথা হুর ও গেলমানের এমন পরিচয় সৃষ্টি হয়ে যাবে, যেমন তারা চিরকাল তাদের মধ্যেই বসবাস করত এবং তাদের সাথে পরিচিত ছিল। এরূপ না হলে অসুবিধা ছিল। কারণ, জান্নাত ছিল একটি নতুন জগৎ। সেখানে নিজ নিজ স্থান খুঁজে নেওয়ার মধ্যে ও সেখানকার বস্তুসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার মধ্যে সময় লাগত এবং বেশ কিছুকাল পর্যন্ত অপরিচিতির অনুভূতির কারণে মন অশান্ত থাকত।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রিওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি আমাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, তোমরা দুনিয়াতে যেমন তোমাদের স্ত্রী ও গৃহকে চিন, তার চাইতেও বেশী জান্নাতে তোমাদের স্থান ও স্ত্রীদেরকে চিনবে এবং তাদের সাথে অন্তরঙ্গতা হবে। (মাযহারী) কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে, প্রত্যেক জান্নাতীর জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে। সে জান্নাতে তার স্থান বলে দেবে এবং সেখানকার স্ত্রীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে।

وَلِلْكَافِرِيْنَ اَمْثَالُهَا—এখানে মক্কার কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করার উদ্দেশ্য যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর যেমন আযাব এসেছে, তেমনি তোমাদের উপরও আসতে পারে। কাজেই তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে যেয়ো না।

مَوْلٰى—وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ অভিভাবক। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর আরেক অর্থ মালিক

কোরআনের অন্যত্র কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ এতে আল্লাহ্ তা'আলাকে কাফিরদেরও মাওলা বলা হয়েছে। কারণ, এখানে মাওলা শব্দের অর্থ মালিক। আল্লাহ্ তা'আলা সবারই মালিক। মু'মিন-কাফির কেউ এই মালিকানার বাইরে নয়।

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٢﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٤﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

(১২) যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। আর যারা কাফির, তারা ভোগবিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মত আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। (১৩) যে জনপদ আপনাকে বহিষ্কার করেছে, তদপেক্ষা কত শক্তিশালী জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। (১৪) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত নিদর্শন অনুসরণ করে, সে কি তার সমান, যার কাছে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করা হয়েছে এবং যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। (১৫) পরহিযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা নিম্নরূপ ঃ তাতে আছে নিষ্কলুষ পানির নহর, দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায়

**তাদের জন্য আছে রকমারি ফলমূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। পরহিযগাররা কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে?**

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। আর যারা কাফির, তারা (দুনিয়াতে) ভোগবিলাসে মত্ত আছে এবং (পরকাল বিস্মৃত হয়ে) চতুষ্পদ জন্তুর মত আহার করে। চতুষ্পদ জন্তুরা চিন্তা করে না যে, তাদেরকে কেন পানাহার করানো হচ্ছে এবং তাদের যিম্মায় এর বিনিময়ে কি প্রাপ্য আছে? তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। (উপরে কাফিরদের ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকার কথা বলা হয়েছে। এতে আপনার শত্রুদের ধোঁকা খাওয়া উচিত নয় এবং তাদের উদাসীনতা দেখে আপনারও দুঃখিত হওয়া সমীচীন নয়। ভোগবিলাসই তাদের বিরোধিতার কারণ। এমনকি, তারা আপনাকে অতিষ্ঠ করে মক্কায়ও বসবাস করতে দেয়নি। কেননা) আপনার যে জনপদ আপনাকে বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করেছে, তদপেক্ষা অনেক শক্তিশালী বহু জনপদকে আমি (আযাব দ্বারা) ধ্বংস করে দিয়েছি, অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। (এমতাবস্থায় এরা কি? এদের অহংকার করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলেই এদেরকে নির্মূল করতে পারেন। আপনি এদের ক্ষণস্থায়ী ভোগবিলাস দেখে দুঃখিত হবেন না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা নির্দিষ্ট সময়ে এদেরকেও শাস্তি দেবেন)। যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত সুস্পষ্ট (ও প্রামাণ্য) পথ অনুসরণ করে, সে কি তাদের সমান হতে পারে, যাদের কাছে তাদের কুকর্ম শোভনীয় মনে হয় এবং যারা তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে? (অর্থাৎ উভয় দলের কাজকর্মে যখন তফাৎ আছে, তখন পরিণতিতেও তফাৎ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যে সত্যপন্থী সে সওয়াবের এবং যে মিথ্যাপন্থী সে আযাব ও শাস্তির যোগ্য। এই সওয়াব ও শাস্তির বর্ণনা এই যে) পরহিযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়, তার অবস্থা নিম্নরূপঃ তাতে আছে নিষ্কলুষ পানির অনেক নহর (এই পানির গন্ধ ও স্বাদে কোন পরিবর্তন হবে না) দুধের অনেক নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের অনেক নহর এবং পরিশোধিত মধুর অনেক নহর। তথায় তাদের জন্য আছে রকমারি ফলমূল এবং (তাতে প্রবেশের পূর্বে) তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে (গোনাহের) ক্ষমা। তারা কি তাদের সমান যারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে এবং তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, অতঃপর তা তাদের নাড়ীভুঁড়িকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে?

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

দুনিয়ার পানির রঙ, গন্ধ ও স্বাদ কোন কোন সময় পরিবর্তিত হয়ে যায়। দুনিয়ার দুধও তেমনি বাসি হয়ে যায়। দুনিয়ার শরাব বিস্বাদ ও তিক্ত হয়ে থাকে। তবে কোন কোন উপকারের কারণে পান করা হয়; যেমন তামাক কড়া হওয়া সত্ত্বেও খাওয়া হয় এবং খেতে

খেতে অভ্যাস হয়ে যায়। জান্নাতের পানি, দুধ ও শরাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সবই পরিবর্তন ও বিস্বাদ থেকে মুক্ত। জান্নাত অন্যান্য অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু থেকেও মুক্ত, একথা সূরা সাফ্‌ফাতের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ এমনিভাবে দুনিয়ার মধুর মধ্যে মোম ও আবর্জনা মিশ্রিত থাকে। এর বিপরীতে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের মধু পরিশোধিত হবে। বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, জান্নাতে আক্ষরিক অর্থেই পানি, দুধ, শরাব ও মধুর চার প্রকার নহর রয়েছে। এখানে রূপক অর্থ নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তবে এটা পরিষ্কার যে, জান্নাতের বস্তুসমূহকে দুনিয়ার বস্তুসমূহের অনুরূপ মনে করা যায় না। সেখানকার প্রত্যেক বস্তুর স্বাদ ও আনন্দ ভিন্নরূপ হবে, যার নযীর পৃথিবীতে নেই।

---

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ حَتّٰٓى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ۣ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ﴿١٦﴾ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ ﴿١٧﴾ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ﴿١٨﴾

---

**(১৬) তাদের মধ্যে কতক আপনার দিকে কান পাতে, অতঃপর যখন আপনার কাছ থেকে বাইরে যায়, তখন যারা শিক্ষিত, তাদেরকে বলে ঃ এইমাত্র তিনি কি বললেন? এদের অন্তরে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। (১৭) যারা সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের সৎপথপ্রাপ্তি আরও বেড়ে যায় এবং আল্লাহ্ তাদেরকে তাকওয়া দান করেন। (১৮) তারা শুধু এই অপেক্ষাই করছে যে, কিয়ামত অকস্মাৎ তাদের কাছে এসে পড়ুক। বস্তুত কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে। সুতরাং কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?**

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

[ হে নবী (সা) ] তাদের মধ্যে কতক ( অর্থাৎ মুনাফিক সম্প্রদায় আপনার প্রচার ও শিক্ষাদানের সময় বাহ্যত ) আপনার দিকে কান পাতে ( কিন্তু আন্তরিকভাবে মোটেও মনোযোগী হয় না )। অতঃপর যখন তারা আপনার কাছ থেকে ( উঠে মজলিস ত্যাগ করে )

বাইরে যায়, তখন অন্যান্য শিক্ষিত ( সাহাবী )-দেরকে বলে ঃ এইমাত্র ( যখন আমরা মজলিসে ছিলাম, তখন ) তিনি কি বলেছিলেন ? ( তাদের একথা বলাও ছিল এক প্রকার বিদ্রূপ বিশেষ। এতে করে একথা বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, আমরা আপনার কথা-বার্তাকে ভ্রূক্ষেপযোগ্যই মনে করি না। এটাও এক প্রকার কপটতাই ছিল)। এরাই তারা, যাদের অন্তরে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন ( ফলে তারা হিদায়েত থেকে দূরে সরে পড়েছে )। এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। ( তাদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে ) যারা সৎপথে আছে ( অর্থাৎ মুসলমান হয়ে গেছে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ( নির্দেশাবলী শ্রবণ করার সময় ) আরও বেশী হিদায়েত করেন ( ফলে তারা নতুন নির্দেশাবলীতেও বিশ্বাস করে অর্থাৎ তাদের ঈমান আনার বিষয়বস্তু বেড়ে যায় অথবা তাদের ঈমানকে আরও বেশী শক্তিশালী করে দেন। এটাই সৎকর্মের বৈশিষ্ট্য ) এবং তাদেরকে তাকওয়ার তওফীক দান করেন। ( অতঃপর মুনাফিক-দের উদ্দেশ্যে এ মর্মে শাস্তির খবর বর্ণিত হচ্ছে যে, তারা আল্লাহ্র নির্দেশাবলী শুনেও প্রভা-বান্বিত হয় না। এতে বোঝা যায় যে ) তারা এ বিষয়েরই অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত অকস্মাৎ তাদের উপর এসে পড়ুক। ( একথা শাসানির ভঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, তারা এখনও যে হিদায়ত অর্জন করছে না, তবে কি তারা কিয়ামতে হিদায়ত হাসিল করবে ? ) অতএব ( মনে রেখ, কিয়ামত নিকটবর্তীই। সেমতে ) তার কয়েকটি লক্ষণ তো এসেই গেছে। ( সেমতে হাদীসদৃষ্টে স্বয়ং শেষ নবীর আগমন এবং নবুওয়তও কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের অন্যতম। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার ঘটনাটি যেমন রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মো'জেযা, তেমনি কিয়ামতের লক্ষণও। এসব লক্ষণ কোরআন অবতরণের সময় প্রকাশ পেয়েছিল। অতঃপর বলা হচ্ছে যে, ঈমান আনা ও হিদায়ত লাভ করার ব্যাপারে কিয়ামতের অপেক্ষা করা নিরেট মূর্খতা। কেননা, সে সময়টি বোঝার ও আমল করার সময় হবে না। বলা হয়েছে ঃ ) যখন কিয়ামত এসে পড়বে, তখন তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে ? ( অর্থাৎ তখন উপদেশ উপকারী হবে না )।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

اشراط শব্দের অর্থ আলামত, লক্ষণ। খাতামুন্নাবীয়্যিন ( সা )-এর আবির্ভাবই কিয়া-মতের প্রাথমিক লক্ষণ। কেননা, খতমে-নবুওয়তও কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। এমনিভাবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযাকে কোরআনে اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটাও কিয়ামতের অন্যতম লক্ষণ। এসব প্রাথমিক আলামত কোরআন অবতরণের সময় প্রকাশ পেয়েছিল। অন্যান্য আলামত সহীহ্ হাদীসসমূহে উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদীস হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে শুনেছেন---নিম্নোক্ত বিষয়গুলো কিয়ামতের আলামত ঃ জ্ঞানচর্চা উঠে যাবে। অজ্ঞানতা বেড়ে যাবে। ব্যভিচারের প্রসার হবে। মদ্যপান বেড়ে যাবে। পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে ; এমনকি, পঞ্চাশ

জন নারীর ভরণ-পোষণ একজন পুরুষ করবে। এক রেওয়ায়েতে আছে, ইলম হ্রাস পাবে এবং মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে।---( বোখারী, মুসলিম )

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যখন যুদ্ধলব্ধ মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হবে এবং আমানতকে যুদ্ধলব্ধ মাল সাব্যস্ত করা হবে ( অর্থাৎ হালাল মনে করে খেয়ে ফেলবে ) যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে ( অর্থাৎ আদায় করতে কুণ্ঠিত হবে ) ইল্‌মে-দীন পার্থিব স্বার্থের জন্য অর্জন করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য ও জননীর অবাধ্যতা করতে শুরু করবে এবং বন্ধুকে নিকটে রাখবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে, মসজিদসমূহে হট্টগোল শুরু হবে, পাপাচারী ব্যক্তি কওমের নেতা হয়ে যাবে, হীনতম ব্যক্তি জাতির প্রতিনিধিত্ব করবে, অত্যাচারের ভয়ে দুষ্ট লোকদের সম্মান করা হবে, গায়িকা নারীদের গানবাদ্য ব্যাপক হয়ে যাবে, বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ঘটবে, মদ্যপান করা হবে এবং উম্মতের সর্বশেষ লোকেরা তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে, তখন তোমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর অপেক্ষা করো ঃ একটি রক্তিম ঝড়ের, ভূমিকম্পের, মানুষের মাটিতে পুঁতে যাওয়ার, আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়ার, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণের এবং কিয়ামতের অন্যান্য আলামতের, যেগুলো একের পর এক এভাবে প্রকাশ পাবে, যেমন মুতির মালা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একটি একটি করে মাটিতে খসে পড়ে।

---

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ﴿١٩﴾

---

(১৯) জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আপনার ত্রুটির জন্য এবং মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্য। আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

( যখন আপনি আল্লাহ্‌র অনুগত ও অবাধ্য উভয় শ্রেণীর অবস্থা ও পরিণতি শুনলেন, তখন ) আপনি ( উত্তমরূপে ) জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। ( এতে ধর্মের যাবতীয় মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা এসে গেছে। কেননা, জেনে রাখুন, বলে পুরোপুরি জেনে রাখা বোঝানো হয়েছে। পুরোপুরি জেনে রাখার জন্য আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পুরোপুরি আমলে আনা অপরিহার্য। মোটকথা এই যে, সমস্ত বিধান সর্বক্ষণ পালন করুন। যদি কোন সময় ত্রুটি হয়ে যায় তা আপনার নিষ্পাপতার কারণে গোনাহ্ নয় ; বরং শুধু উত্তমকে বর্জন করার শামিল হবে। কিন্তু আপনার উচ্চমর্যাদার দিক দিয়ে দৃশ্যত ত্রুটি। তাই ) আপনি ( এই বাহ্যিক ) ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সব মু'মিন পুরুষ ও নারীর জন্যও ( ক্ষমার দোয়া করতে থাকুন। একথাও স্মর্তব্য যে ) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থানের ( অর্থাৎ সব অবস্থা ও কাজকর্মের ) খবর রাখেন।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক মু'মিন-মুসলমানও একথা জানে, পয়গম্বরকুল শিরোমণি একথা জানবেন না কেন ? এমতাবস্থায় এই জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দানের অর্থ হয় এর উপর দৃঢ় ও অটল থাকা, না হয় তদনুযায়ী আমল করা। কুরতুবী বর্ণনা করেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে কেউ ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন ঃ তুমি কি কোরআনের এই বাণী শ্রবণ করনি فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ এতে ইলমের পর আমলের নির্দেশ রয়েছে। অন্যত্র আছে سَابِقُوا إِلَى ঃ আরও বলা হয়েছে ঃ اِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ মَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ এরপর বলা হয়েছে فَاحْذَرُوهُمْ এসব জায়গায় প্রথমে ইলম অতঃপর তদনুযায়ী আমল করার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও রসূলুল্লাহ্ (সা) যদিও পূর্ব থেকে একথা জনতেন, কিন্তু উদ্দেশ্য তদনুযায়ী আমল করা। এ কারণেই এরপর وَاسْتَغْفِرْ অর্থাৎ ইস্তিগফারের আদেশ দান করা হয়েছে। পয়গম্বরসুলভ পবিত্রতার কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে যদিও এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু পয়গম্বরগণ গোনাহ্ থেকে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও স্থল বিশেষে ইজতিহাদী ভুল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। শরীয়তের আইনে ইজতিহাদী ভুল গোনাহ্ নয় ; বরং এই ভুলেরও সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু পয়গম্বর-গণকে এই ভুল সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করে দেওয়া হয় এবং তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই ভুলকে ذَنْب তথা গোনাহ্ শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়, যেমন সূরা আবাসায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ কঠোর সতর্কবাণী এই ইজতিহাদী ভুলেরই একটি দৃষ্টান্ত। সূরা আবাসায় এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে যে, সেই ইজতিহাদী ভুল যদিও গোনাহ্ ছিল না ; বরং এরও এক সওয়াব পাওয়ার ওয়াদা ছিল ; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে সেই ভুলকে পছন্দ করা হয়নি। আলোচ্য আয়াতে এমনি ধরনের গোনাহ্ বোঝানো যেতে পারে।

**জ্ঞাতব্য ঃ** হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমরা বেশী পরিমাণে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ কর এবং ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা

কর। ইবলীস বলে ঃ আমি মানুষকে গোনাহে্ লিপ্ত করে ধ্বংস করেছি, প্রত্যুত্তরে তারা আমাকে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করে ধ্বংস করেছে। এই অবস্থা দেখে আমি তাদেরকে এমন অসার কল্পনার অনুসারী করে দিয়েছি, যা তারা সৎ কাজ মনে করে সম্পন্ন করে ( যেমন সাধারণ বিদ'আতসমূহের অবস্থা তদ্রূপই )। এতেকরে তাদের তওবা করারও তওফীক হয় না।

مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰكُمْ — مُتَقَلَّب-এর শাব্দিক অর্থ ওলটপালট হওয়া এবং مَثْوٰى শব্দের অর্থ অবস্থানস্থল। তফসীরবিদগণ এই শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সবগুলোর অর্থই এখানে উদ্দিষ্ট। কেননা, প্রত্যেক মানুষের উপর দ্বিবিধ অবস্থা আসে। এক. যে অবস্থার সাথে সে সাময়িক ও অস্থায়ীভাবে জড়িত হয় এবং দুই. যে অবস্থাকে সে স্থায়ী বৃত্তি মনে করে। এমনিভাবে কোন কোন গৃহে মানুষ অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে এবং কোন কোন গৃহে স্থায়ীভাবে। আয়াতে অস্থায়ীকে مُتَقَلَّب শব্দ দ্বারা এবং স্থায়ীকে مَثْوٰى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এভাবে আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ মানুষের যাবতীয় অবস্থার খবর রাখেন।

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ
مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ
مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۭ فَاَوْلٰى
لَهُمْ ﴿٢٠﴾ طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ۣ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۣ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ
لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢١﴾ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي
الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ
وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ
اَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ۭ وَاَمْلٰى لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا
لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ

إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ

وَاَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا

رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ

بِسِيْمٰهُمْ ؕ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ

وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

(২০) যারা মু'মিন, তারা বলেঃ একটি সূরা নাযিল হয় না কেন ? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জিহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে , আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য! (২১) তাদের আনুগত্য ও মিষ্ট বাক্য জানা আছে। অতএব জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহ্‌র প্রতি প্রদত্ত অংগীকার পূর্ণ করে, তবে তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। (২২) ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। (২৩) এদের প্রতিই আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। (২৪) তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না। না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ ? (২৫) নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্য তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। (২৬) এটা এজন্য যে, তারা তাদেরকে বলে, যারা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ কিতাব, অপছন্দ করেঃ আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করব। আল্লাহ তাদের গোপন পরামর্শ অবগত আছেন। (২৭) ফেরেশতা যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে ? (২৮) এটা এজন্য যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহ্‌র অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন। (২৯) যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না ? (৩০) আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের সাথে পরিচিত করে দিতাম। তখন আপনি তাদের চেহারা দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন এবং আপনি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন। আল্লাহ্ তোমাদের কর্মসমূহের খবর রাখেন। (৩১) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব

**যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জিহাদকারীদেরকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থাসমূহ যাচাই করি।**

---

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

যারা মু'মিন, তারা ( তো সর্বদা উৎসুক থাকে যে, আরও কালাম নাযিল হোক, যাতে ঈমান তাজা হয় এবং নতুন নতুন নির্দেশ আসলে তারও সওয়াব হাসিল করা যায়; আর সাবেক নির্দেশের তাকীদ আসলে আরও দৃঢ়তা অর্জিত হয়। এই ঔৎসুক্যের কারণে ) বলে, কোন ( নতুন ) সূরা নাযিল হয় না কেন? ( নাযিল হলে আমাদের আশা পূর্ণ হত )। অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন ( বিষয়বস্তুর ) সূরা নাযিল হয় এবং ( ঘটনাক্রমে ) তাতে জিহাদেরও ( পরিষ্কার ) উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে ( মুনাফিকীর ) রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যু ভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত ( ভয়ানক দৃষ্টিতে ) তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। ( এরূপ তাকানোর কারণ ভয় ও কাপুরুষতা। কারণ, এখন ঈমানের দাবী সপ্রমাণের জন্য তাদের জিহাদে যেতে হবে। তারা যে এভাবে আল্লাহ্র নির্দেশ থেকে গা বাঁচিয়ে চলে, ) অতএব ( আসল কথা এই যে ) সত্বরই তাদের দুর্ভোগ আসবে। ( দুনিয়াতেও কোন বিপদে গ্রেফতার হবে, নতুবা পরকালে তো অবশ্যই হবে। অবসর সময়ে যদিও তারা আনুগত্য ও খোশামোদের অনেক কথাবার্তা বলে, কিন্তু ) তাদের আনুগত্য ও মিষ্টবাক্য ( অর্থাৎ মিষ্টবাক্যের স্বরূপ ) জানা আছে। ( জিহাদের নির্দেশ নাযিল হওয়ার সময় তাদের অবস্থা দেখে এখন সবার কাছেই তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে )। অতঃপর ( জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর ) যখন জিহাদের প্রস্তুতি হয়েই যায়, তখন ( ও ) যদি তারা ( ঈমানের দাবীতে ) আল্লাহ্র কাছে সাচ্চা থাকে ( অর্থাৎ ঈমানের দাবী অনুযায়ী সাধারণভাবে সব নির্দেশ এবং বিশেষভাবে জিহাদের নির্দেশ পালন করে এবং খাঁটি মনে জিহাদ করে ) তবে তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। ( অর্থাৎ প্রথমে মুনাফিক থাকলে শেষেও যদি তওবা করত, তবু তাদের ঈমান গ্রহণীয় হত। অতঃপর জিহাদের তাকীদ এবং যারা জিহাদে যোগদান না করে গৃহে রয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ তোমরা যে জিহাদকে পছন্দ কর না, তাতে তো একটি পার্থিব ক্ষতিও আছে। সেমতে) যদি তোমরা এমনিভাবে সবাই জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখ, তবে সম্ভবত তোমরা ( অর্থাৎ সব মানুষ ) পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। ( অর্থাৎ জিহাদের বড় উপকারিতা হচ্ছে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। যদি জিহাদ ত্যাগ করা হয়, তবে অনর্থকারীদের বিজয় হবে এবং সব মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা থাকবে না। এরূপ ব্যবস্থা না থাকার কারণে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অধিকার হরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। সুতরাং যে জিহাদে পার্থিব উপকারও আছে, তা থেকে পশ্চাতে সরে যাওয়া আরও আশ্চর্যজনক ব্যাপার। অতঃপর মুনাফিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে ) এদেরকেই আল্লাহ্ তা'আলা রহমত থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন ( তাই বিধানাবলী পালন করার তওফীক নেই ) অতঃপর ( রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার ফলস্বরূপ ) তাদেরকে ( কবূলের নিয়তে বিধানাবলী শ্রবণ করা থেকে ) বধির করে দিয়েছেন এবং ( সৎপথ দেখার ব্যাপারে তাদের ( অন্তর ) দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিয়েছেন। ( এরপর বলা হয়েছে যে, কোরআনে

জিহাদ ও অন্যান্য বিধিবিধানের অপরিহার্যতা, কোরআনের সত্যতার প্রমাণাদি, বিধানাবলীর পারলৌকিক ও ইহলৌকিক উপকারিতা এবং বিধানাবলীর বিরুদ্ধাচরণের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তারা যে এদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না, তবে ) তারা কি কোরআন (---এর অলৌকিকতা ও বিষয়বস্তু ) সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না ? ফলে তারা জানতে পারে না ) না ( চিন্তা করে, কিন্তু ) তাদের অন্তরে ( অদৃশ্য তালা লেগে আছে ? ( এতদুভয়ের মধ্যে একটি অবশ্যই হয়েছে এবং উভয়টিও হতে পারে। বাস্তবে এ স্থলে উভয়টিই হয়েছে। প্রথমত তারা অস্বীকারের কারণে কোরআন সম্পর্কে চিন্তা করেনি এরপর এর শাস্তিস্বরূপ অন্তরে তালা লেগে গেছে। একে خَتْم طبع অর্থাৎ মোহর মারাও বলা হয়েছে। এর প্রমাণ এই আয়াত ঃ

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ---এই সমষ্টি ফল হচ্ছে

فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ---অতঃপর চিন্তা না করার কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ যারা সোজা পথ

( কোরআনের অলৌকিকতার মত যুক্তিগত প্রমাণাদি দ্বারা এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের ভবিষ্যদ্বাণীর মত ইতিহাসগত প্রমাণাদি দ্বারা ) ব্যক্ত হওয়ার পর ( সত্যের প্রতি ) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, শয়তান তাদেরকে ধোঁকা দেয় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয় ( যে, ঈমান আনার ফলে অমুক অমুক বর্তমান অথবা ভবিষ্যত প্রত্যাশিত উপকারিতা ফওত হয়ে যাবে। মোট-কথা, চিন্তা না করার কারণ হচ্ছে হঠকারিতা। কারণ হিদায়তের সুস্পষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও তারা উল্টো দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই হঠকারিতার পর শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর কর্মকে শোভন করে দেখিয়েছে। এর ফলে তারা চিন্তা করে না এবং চিন্তা না করার কারণে অন্তরে মোহর লেগেছে )। এটা ( অর্থাৎ হিদায়ত সামনে এসে যাওয়া সত্ত্বেও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও দূরে সরে পড়া ) এজন্য যে, তারা তাদেরকে---যারা আল্লা-হ্র অবতীর্ণ বিধানাবলীকে ( হিংসাবশত ) অপছন্দ করে [ অর্থাৎ ইহুদী সরদারগণ। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি হিংসা পোষণ করত এবং সত্য জানা সত্ত্বেও অনুসরণ করতে লজ্জাবোধ করত। মোটকথা, মুনাফিকরা ইহুদী সরদারদেরকে ] বলে ঃ আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মেনে নেব। ( অর্থাৎ তোমরা আমাদেরকে মুহাম্মদের অনু-সরণ করতে নিষেধ কর। এর দু'টি অংশ আছে ঃ এক. বাহ্যিক অনুসরণ না করা এবং দুই. আন্তরিক অনুসরণ না করা। প্রথম অংশের ব্যাপারে তো আমরা উপকারিতাবশত তোমাদের কথা মেনে নিতে পারি না। কিন্তু দ্বিতীয় অংশের ব্যাপারে মেনে নেব। কেননা, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের সাথে ; যেমন বলা হয়েছে ঃ إِنَّا مَعَكُمْ উদ্দেশ্য এই যে, সত্য থেকে মুখ ফিরানোর কারণ জাতিগত বিদ্বেষ এবং অন্ধ অনুকরণ। যদিও এ ধরনের কথাবার্তা মুনাফিকরা গোপনে বলে ; কিন্তু ) আল্লাহ্ তাদের গোপন কথাবার্তা ( সম্যক ) অবগত

আছেন। (ওহীর মাধ্যমে কোন কোন বিষয় সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করে দেন। অতঃপর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হচ্ছে, যা أَوْلَىٰ لَهُمْ এর তফসীর হিসেবে হতে পারে ; অর্থাৎ তারা যে এমন কাণ্ড করছে) তাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন ফেরেশতা তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে তাদের প্রাণ হরণ করবে? এটা (অর্থাৎ এই শাস্তি) এ কারণে (হবে) যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহ্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি (অর্থাৎ সন্তুটি সৃষ্টিকারী আমলসমূহ)-কে ঘৃণা করে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (সৎ) কর্মসমূহকে (প্রথম থেকেই) ব্যর্থ করে দিয়েছেন। (সুতরাং তারা এই শাস্তির যোগ্য হয়ে গেছে। কারও কোন মকবুল আমল থাকলে তার বরকতে শাস্তি কিছু না কিছু হ্রাস পায়। অতঃপর وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ -এর তফসীর হিসাবে বলা হচ্ছে ঃ) যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) রোগ আছে, (এবং তারা তা গোপন করতে চায়) তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কখনও তাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ করবেন না? (অর্থাৎ তারা এটা কিরূপে মনে করতে পারে, যেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা যে আলিমুল গায়ব, তা প্রমাণিত ও স্বীকৃত?) আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের পূর্ণ পরিচয় বলে দিতাম ; ফলে আপনি তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারতেন)। পূর্ণ পরিচয়ের অর্থ এই যে, তাদের চেহারার আকার-আকৃতি বলে দিতাম। যদিও রহস্যবশত আমি এরূপ বলিনি, কিন্তু) আপনি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে এখনও তাদেরকে চিনতে পারবেন। (কেননা, তাদের কথাবার্তা সত্যের উপর ভিত্তিশীল নয়। অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সত্য ও মিথ্যাকে চিনার ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দান করেছেন। ফলে সত্য ও মিথ্যার প্রভাব অন্তরে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিফলিত হত। এক হাদীসে আছে, সত্য প্রশান্তি দান করে এবং মিথ্যা সন্দেহ সৃষ্টি করে। অতঃপর মু'মিন ও মুনাফিক সবাইকে একত্রে সম্বোধন করে উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে ঃ) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সবার কর্মসমূহের খবর রাখেন। (সুতরাং মুসলমানদেরকে তাদের আন্তরিকতার প্রতিদান এবং মুনাফিকদেরকে তাদের কপটতা ও প্রতারণার শাস্তি দেবেন। অতঃপর জিহাদ ইত্যাদির ন্যায় কঠিন বিধানাবলীর একটি রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে যেমন, উপরে فَهَلْ عَسَيْتُمْ الخ আয়াতে একটি রহস্য বর্ণিত হয়েছিল)। আমি (কঠিন বিধানাবলীর নির্দেশ দিয়ে) অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যাতে আমি (বাহ্যতও) তাদেরকে জেনে ও পৃথক করে) নিই ; যারা জিহাদ করে এবং যারা জিহাদে দৃঢ়পদ থাকে এবং যাতে তোমাদের অবস্থা যাচাই করে নিই। (যাতে জিহাদের নির্দেশের মধ্যে অন্য নির্দেশাবলীও এবং মোজাহাদা ও সবরের অবস্থার মধ্যে অন্যান্য অবস্থাও দাখিল হয়ে যায়, সেজন্য এই বাক্য সংযুক্ত করা হয়েছে)।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

سُوْرَةٌ مُحْكَمَةٌ—مُحْكَمَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ মজবুত ও অনড়। এই আভিধানিক অর্থে কোরআনের প্রত্যেক সূরাই مُحْكَمَةٌ কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় مُحْكَم শব্দটি مَنْسُوْخ তথা রহিতের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। এখানে সূরার সাথে 'মোহ্কামাহ্' সংযুক্ত করার তাৎপর্য এই যে, সূরা মনসূখ ও রহিত না হলেই আমলের সাধ পূর্ণ হতে পারে। কাতাদাহ (র) বলেন ঃ যেসব সূরায় যুদ্ধ ও জিহাদের বিধানাবলী বিধৃত হয়েছে, সেগুলো সব 'মোহ্কামাহ্' তথা অরহিত। এখানে আসল উদ্দেশ্য জিহাদের নির্দেশ ও তা বাস্তবায়ন। তাই সূরার সাথে মোহকামাহ্ শব্দ যুক্তি করে জিহাদের আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ আসছে।--- ( কুরতুবী )

أَوْلٰى لَهُمْ আসমায়ীর উক্তি অনুযায়ী এর অর্থ قَارَبَهُ مَا يُهْلِكُهُ অর্থাৎ তার ধ্বংসের কারণসমূহ আসন্ন।---( কুরতুবী )

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ

আভিধানিক দিক দিয়ে تَوَلّى শব্দের দুই অর্থ সম্ভবপর। এক. মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ও দুই. কোন দলের উপর শাসন ক্ষমতা লাভ করা। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ প্রথম অর্থ নিয়েছেন, যা উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে লিখিত হয়েছে। আবূ হাইয়ান (র) বাহ্রে-মুহীতে এই অর্থকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা শরীয়তের বিধানাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও ---জিহাদের বিধানও এর অন্ত-র্ভুক্ত, তবে এর প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, তোমরা মূর্খতা যুগের প্রাচীন পদ্ধতির অনুসারী হয়ে যাবে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। মূর্খতা যুগের প্রত্যেকটি কাজে এই পরিণতি প্রত্যক্ষ করা হত। এক গোত্র অন্য গোত্রের উপর হানা দিত এবং হত্যা ও লুটতরাজ করত। সন্তানদেরকে স্বহস্তে জীবন্ত কবরস্থ করত। ইসলাম মূর্খতা যুগের এসব কুপ্রথা মেটানোর জন্য জিহাদের নির্দেশ জারি করেছে। এটা যদিও বাহ্যত রক্তপাত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সারমর্ম হচ্ছে পচা, গলিত অঙ্গকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, যাতে অবশিষ্ট দেহ নিরাময় ও সুস্থ থাকে। জিহাদের মাধ্যমে ন্যায়, সুবিচার এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্মানিত ও সুসংহত হয়। রূহুল মা'আনী, কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে تَوَلّى শব্দের অর্থ 'রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভ করা' নেওয়া হয়েছে। এমতা-বস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে অর্থাৎ দেশ ও জাতির শাসনক্ষমতা লাভ করলে এর পরিণতি এ ছাড়া কিছুই হবে না যে, তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

**আত্মীয়তা বজায় রাখার কঠোর তাকীদ ঃ** ارحام শব্দটি رحم -এর বহুবচন। এর অর্থ জননীর গর্ভাশয়। সাধারণ সম্পর্ক ও আত্মীয়তার ভিত্তি সেখান থেকেই সূচিত হয়, তাই বাকপদ্ধতিতে رحم শব্দটি আত্মীয়তা ও সম্পর্কের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে তফসীরে রূহুল মা'আনীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, ذوى الارحام ও ارحام শব্দ কোন্ কোন্ আত্মীয়তাতে পরিব্যাপ্ত। ইসলাম আত্মীয়তার হক আদায় করার জন্য খুবই তাকীদ করেছে। বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও অন্য দুজন সাহাবী থেকে এই বিষয়বস্তুর হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বজায় রাখবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নৈকট্য দান করবেন এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ছিন্ন করবেন। এ থেকে জানা গেল যে, আত্মীয় ও সম্পর্কশীলদের সাথে কথায়, কর্মে ও অর্থ ব্যয়ে সহৃদয় ব্যবহার করার জোর নির্দেশ আছে। উপরোক্ত হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আলোচ্য আয়াতের বরাতও দিয়েছেন যে, ইচ্ছা করলে কোরআনের এই আয়াতটি দেখে নাও। অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব গোনাহের শাস্তি ইহকালেও দেন এবং পরকালেও দেন, সেগুলোর মধ্যে নিপীড়ন ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার সমান কোন গোনাহ্ নেই।—(আবূ দাউদ-তিরমিযী) হযরত সওবানের বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আয়ু বৃদ্ধি ও রুযী-রোযগারে বরকত কামনা করে সে যেন আত্মীয়দের সাথে সহৃদয় ব্যবহার করে। সহীহ্ হাদীসসমূহে আরও বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার অধিকারের ক্ষেত্রে অপর পক্ষ থেকে সদ্ব্যবহার আশা করা উচিত নয়। যদি অপরপক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহারও করে, তবুও তার সাথে তোমার সদ্ব্যবহার করা উচিত। সহীহ্ বুখারীতে আছে ঃ

ليس الواصل بالمكافى ولكن الواصل الذى اذا قطعت رحمه وصلها

অর্থাৎ সে ব্যক্তি আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহারকারী নয়, যে কেবল প্রতিদানের সমান সদ্ব্যবহার করে; বরং সেই সদ্ব্যবহারকারী, যে অপর পক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখে।—(ইবনে কাসীর)

أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ—অর্থাৎ যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন। অর্থাৎ তাদেরকে রহমত থেকে দূরে রাখেন। হযরত ফারুকে আযম (রা) এই আয়াতদৃষ্টেই উম্মুল ওলাদের বিক্রয় অবৈধ সাব্যস্ত করেন। অর্থাৎ যে মালিকানাধীন বাঁদীর গর্ভ থেকে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে বিক্রয় করলে সন্তানের সাথে তার সম্পর্কের ছিন্ন হবে, যা অভিসম্পাতের কারণ। তাই এরূপ বাঁদী বিক্রয় করা হারাম।—(হাকেম)

**কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাতের বিধান এবং এজিদকে অভিসম্পাত করার ব্যাপারে আলোচনা ঃ** হযরত ইমাম আহমদ (র)-এর পুত্র আবদুল্লাহ্ পিতাকে এজিদের প্রতি অভিসম্পাত করার অনুমতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ সে ব্যক্তির প্রতি কেন অভিসম্পাত করা হবে না, যার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে অভিসম্পাত করেছেন?

তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করে বললেন ঃ এজিদের চাইতে অধিক আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন-কারী আর কে হবে, যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্পর্ক ও আত্মীয়তার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেনি ? কিন্তু অধিকাংশ আলিমের মতে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করা বৈধ নয়, যে পর্যন্ত তার কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করা নিশ্চিতরূপে জানা না যায়। হ্যাঁ, সাধারণ বিশেষণ-সহ অভিসম্পাত করা জায়েয ; যেমন মিথ্যাবাদীর প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত, দুষ্কৃতকারীর প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত ইত্যাদি।—( রূহুল মা'আনী, খণ্ড ২৬, পৃষ্ঠা ৭২ )

أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا—অন্তরে তালা লেগে যাওয়ার অর্থ তাই, যা অন্যান্য আয়াতে خَتْم ও طَبْع অর্থাৎ মোহর লেগে যাওয়া বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য অন্তর এমন কঠোর ও চেতনাহীন হয়ে যাওয়া যে, ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করতে থাকে। এর কারণেই মানুষ সাধারণত বিরামহীনভাবে গোনাহে লিপ্ত থাকে। ( নাউযুবিল্লাহ্ মিনহু )

اَلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ—এতে শয়তানকে দু'টি কাজের কর্তা বলা হয়েছে। এক. تَسْوِيل—এর অর্থ সুশোভিত করা ; অর্থাৎ মন্দ বিষয় অথবা মন্দ কর্মকে কারও দৃষ্টিতে সুন্দর ও সুশোভিত করে দেওয়া। দুই. إِمْلَاء এর অর্থ অবকাশ দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান প্রথমে তো তাদের মন্দ কর্মসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে ভাল ও শোভন করে দেখিয়েছে, এরপর তাদেরকে এমন দীর্ঘ আশায় জড়িত করে দিয়েছে, যা পূর্ণ হওয়ার নয়।

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ

أَضْغَان শব্দটি ضِغْن-এর বহুবচন। এর অর্থ গোপন শত্রুতা ও বিদ্বেষ। মুনাফিকরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করত এবং বাহ্যত রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মহব্বত প্রকাশ করত, কিন্তু অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করত। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনকে আলিমুল গায়েব জানা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কেন নিশ্চিন্ত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরের গোপন ভেদ ও বিদ্বেষকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন ? ইবনে কাসীর বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বারাআতে তাদের ক্রিয়া-কর্মের পরিচয় বলে দিয়েছেন, যদ্দ্বারা বোঝা যায় যে, কারা মুনাফিক। এ কারণেই সূরা বারা-আতকে সূরা ফাযিহা অর্থাৎ অপমানকারী সূরাও বলা হয়। কেননা এই সূরা মুনাফিকদের বিশেষ বিশেষ আলামত প্রকাশ করে দিয়েছে।

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ—অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে নির্দিষ্ট করে মুনাফিকদের দেখিয়ে দিতে পারি এবং তাদের এমন আকার-আকৃতি বলে দিতে পারি, যদ্দ্বারা আপনি প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতে পারতেন। এখানে

لو অব্যয়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে। এতে ব্যাকরণিক নিয়ম অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিহ্নিত করে আপনাকে বলে দিতাম ঃ কিন্তু রহস্য ও উপযোগিতাবশত আমার সহনশীলতা গুণের কারণে তাদেরকে এভাবে লাঞ্ছিত করা পছন্দ করিনি, যাতে এই বিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, প্রত্যেক বিষয়কে বাহ্যিক অর্থে বোঝাতে হবে এবং অন্তরগত অবস্থা ও গোপন বিষয়াদিকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সোপর্দ করতে হবে। তবে আমি আপনাকে এমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছি যে, আপনি মুনাফিকদেরকে তাদের কথাবার্তার ভঙ্গি দ্বারা চিনে নিতে পারবেন।---( ইবনে কাসীর )

হযরত ওসমান গনী (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিষয় অন্তরে গোপন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার চেহারা ও অনিচ্ছাপ্রসূত কথা দ্বারা তা প্রকাশ করে দেন। অর্থাৎ কথাবার্তার সময় তার মুখ থেকে এমন বাক্য বের হয়ে যায়, যার ফলে তার মনের ভেদ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এমনি এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্তরে কোন বিষয় গোপন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সত্তার উপর সেই বিষয়ের চাদর ফেলে দেন। বিষয়টি ভাল হলে তা প্রকাশ না হয়ে পারে না এবং মন্দ হলেও প্রকাশ না হয়ে পারে না। কোন কোন হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, একদল মুনাফিকের ব্যক্তিগত পরিচয়ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেওয়া হয়েছিল। মসনদে আহমদে ওকবা ইবনে আমরের হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার এক খোতবায় ছত্রিশ জন মুনাফিকের নাম বলে বলে তাদেরকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দেন। হাদীসে তাদের নাম গণনা করা হয়েছে।---( ইবনে কাসীর )

حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ—আল্লাহ্ তা'আলা তো সৃষ্টির আদিকাল থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সর্বব্যাপী জ্ঞান রাখেন। এখানে জানার অর্থ প্রকাশ হওয়া। অর্থাৎ যে বিষয়টি আল্লাহ্র জ্ঞানে পূর্ব থেকেই ছিল, তার বাস্তবভিত্তিক ও ঘটনা-ভিত্তিক জ্ঞান হয়ে যাওয়া।---( ইবনে কাসীর )

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۝ فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْۤا

إِلَى السَّلْمِ ۖ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ ۖ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾
إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ
أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَ
يُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾ هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ
وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ
ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ﴿٣٨﴾

(৩২) নিশ্চয় যারা কাফির এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্য সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর রসূল (সা)-এর বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহ্‌র কোনই ক্ষতি করতে পারবে না এবং তিনি ব্যর্থ করে দিলেন তাদের কর্মসমূহকে। (৩৩) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রসূল (সা)-এর আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। (৩৪) নিশ্চয় যারা কাফির এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে অতঃপর কাফির অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ্ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (৩৫) অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহবান জানিও না, তোমরাই হবে প্রবল। আল্লাহ্ই তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনও তোমাদের কর্ম হ্রাস করবেন না। (৩৬) পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংযম অবলম্বন কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না। (৩৭) তিনি তোমাদের কাছে ধনসম্পদ চাইলে অতঃপর তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করলে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দেবেন। (৩৮) শুন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার আহবান জানানো হচ্ছে, অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

নিশ্চয় যারা কাফির এবং ( অন্য মানুষকেও ) আল্লাহ্‌র পথ ( অর্থাৎ সত্যধর্ম ) থেকে

ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্য সৎ ( অর্থাৎ ধর্মের ) পথ ( যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে মুশরিক-দের জন্য ও ইতিহাসগত প্রমাণাদির মাধ্যমে কিতাবধারীদের জন্য ) ব্যক্ত হওয়ার পর রসূল (সা)-এর বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহ্র ( অর্থাৎ আল্লাহ্র ধর্মের ) কোনই ক্ষতি করতে পারবে না ( বরং এই ধর্ম সর্বাবস্থায় পূর্ণতা লাভ করবে। সেমতে তাই হয়েছে ) এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রচেষ্টাকে ( যা সত্য ধর্ম মিটানোর জন্য তারা করছে ) নস্যাৎ করে দেবেন। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং [ যেহেতু রসূল (সা) আল্লাহ্রই বিধান বর্ণনা করেন---বিশেষ করে ওহীর মাধ্যমে বর্ণিত বিধান হোক অথবা ওহী বর্ণিত সামগ্রিক বিধির আওতাভুক্ত বিধান হোক---তাই ] রসূল (সা)-এর ( ও ) আনুগত্য কর এবং ( কাফির-দের ন্যায় আল্লাহ্ ও রসূলের বিরোধিতা করে ) নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। ( এর বিবরণ আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ে আসবে )। নিশ্চয় যারা কাফির এবং আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে, অতঃপর কাফির অবস্থায়ই মারা যায়, আল্লাহ্ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। ( ক্ষমা না করার জন্য কুফরের সাথে আল্লাহ্র পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা শর্ত নয়; বরং শুধু মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থাকারই এটা প্রতিক্রিয়া। কিন্তু অধিক ভর্ৎসনার জন্য এই বাস্তব কথাটি সংযুক্ত করা হয়েছে যে, তখনকার কাফির সরদারদের মধ্যে এই দোষটিও বিদ্যমান ছিল। যখন জানা গেল যে, মুসলমানরা আল্লাহ্র প্রিয় এবং কাফিররা অপ্রিয়, তখন হে মুসলমানগণ ) তোমরা ( কাফিরদের মুকাবিলায় ) হীনবল হয়ো না এবং ( হীনবল হয়ে তাদেরকে ) সন্ধির আহ্বান জানিও না, তোমরাই প্রবল হবে ( এবং তারা পরাভূত হবে। কেননা, তোমরা প্রিয় ও তারা অপ্রিয় )। আল্লাহ্ তোমাদের সাথে আছেন ( এটা তোমাদের পার্থিব সাফল্য এবং পরকালে এই সাফল্য হবে যে ) তিনি তোমাদের কর্মকে ( অর্থাৎ কর্মের সওয়াবকে ) হ্রাস করবেন না। ( এটা হচ্ছে জিহাদের উৎসাহ প্রদান। অতঃপর দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা উল্লেখ করে জিহাদের উৎসাহ এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার ভূমিকা প্রদান করা হচ্ছে ) পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা। ( এতে যদি নিজের উপকারের জন্য জান ও মালকে বাঁচিয়ে রাখতে চাও, তবে এই উপকারই কয়দিনের এবং এর সারমর্মই কি? ) যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংযম অবলম্বন কর, ( এতে জান ও মালের বিনিময়ে জিহাদও এসে গেছে ) তবে আল্লাহ্ নিজের কাছ থেকে তোমাদের উপকার করবেন এভাবে যে তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং ( তোমাদের কাছে কোন উপকার প্রত্যাশা করবেন না। সেমতে ) তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ ( ও যা প্রাণের তুলনায় সহজ নিজের উপকারের জন্য ) চাইবেন না, ( যা দেওয়া সহজ তাই যখন চাইবেন না, তখন যা দেওয়া কঠিন তা কিরূপে চাইবেন? বলা বাহুল্য, আমাদের জান ও মাল খরচ করলে আল্লাহ্ তা'আলার কোন উপকার হয় না এবং তা সম্ভবও নয়। যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ সেমতে ) যদি ( পরীক্ষাস্বরূপ ) তিনি তোমাদের কাছে ধনসম্পদ চান, অতঃপর তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করেন ( অর্থাৎ সমুদয় ধনসম্পদ চান ), তবে তোমরা ( অর্থাৎ তোমা-দের অধিকাংশ লোক ) কার্পণ্য করবে ( অর্থাৎ দিতে চাইবে না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা

তোমাদের অনীহা প্রকাশ করে দেবেন। তাই এই সম্ভবপর বিষয়টিকেও বাস্তবায়িত করা হয়নি)। হ্যাঁ, তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে (যার উপকার নিশ্চিতরূপে তোমরাই পাবে— স্বল্প পরিমাণ ধনসম্পদ) ব্যয় করার আহবান জানানো হয় (অবশিষ্ট বিপুল ধনসম্পদ তোমাদের অধিকারে ছেড়ে দেওয়া হয়) অতঃপর (এর জন্যও) তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করে, তারা (প্রকৃতপক্ষে নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করে। অর্থাৎ নিজেদেরকেই এর চিরস্থায়ী উপকার থেকে বঞ্চিত রাখে) আল্লাহ্‌ কারও মুখাপেক্ষী নন (যে তাঁর ক্ষতির আশংকা থাকতে পারে) এবং তোমরা সবাই (তাঁর) মুখাপেক্ষী। (তোমাদের এই মুখাপেক্ষিতার কারণেই তোমাদেরকে ব্যয় করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, পরকালে তোমাদের সওয়াব দরকার হবে। এসব কর্মই সওয়াব লাভের উপায়)। যদি তোমরা (আমার বিধানাবলী থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আল্লাহ্‌ তোমাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন। অতঃপর তারা তোমাদের মত (অবাধ্য) হবে না (বরং অত্যন্ত অনুগত হবে। এই কাজ তাদের দ্বারা করানো হবে এবং এভাবে সেই রহস্যপূর্ণতা লাভ করবে)।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ — আলোচ্য আয়াতও মুনাফিক এবং ইহুদী বনী কোরায়যা ও বনী নুসায়ের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই আয়াত সেসব মুনাফিকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধের সময় কোরাইশ-কাফিরদেরকে সাহায্য করেছে এবং তাদের বারজন লোক সমগ্র কোরাইশ বাহিনীর পানাহারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। প্রত্যহ একজন লোক গোটা কাফির বাহিনীর পানাহারের ব্যবস্থা করত।

وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ — এখানে 'কর্ম বিনষ্ট' করার অর্থ এরূপও হতে পারে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেবেন না; বরং ব্যর্থ করে দেবেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই লিখিত হয়েছে। এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কুফর ও নিফাকের কারণে তাদের সৎকর্মসমূহ যেমন সদকা, খয়রাত ইত্যাদি সব নিষ্ফল হয়ে যাবে — গ্রহণযোগ্য হবে না।

لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ — কোরআন পাক এ স্থলে حبط এর পরিবর্তে ابطال উল্লেখ করেছে। এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা বাতিল করা এক প্রকার কুফরের কারণে প্রকাশ পায়, যা উপরের আয়াতে حبط শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আসল কাফিরের কোন আমল কুফরের কারণে গ্রহণযোগ্যই হয় না। ইসলাম গ্রহণ করার পর যে ব্যক্তি ইসলামকে ত্যাগ করে মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়, তার ইসলামকালীন সৎকর্ম যদিও গ্রহণযোগ্য ছিল; কিন্তু তার কুফর ও ধর্মত্যাগ সেসব কর্মকেও নিষ্ফল করে দেয়।

আমল বাতিল করার দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কোন কোন সৎ কর্মের জন্য অন্য সৎ কর্ম করা শর্ত। যে ব্যক্তি এই শর্ত পূরণ করে না, সে তার সৎ কর্মও বিনষ্ট করে দেয়। উদাহরণত প্রত্যেক সৎকর্ম কবূল হওয়ার শর্ত এই যে, তা খাঁটিভাবে আল্লাহ্র জন্য হতে হবে, তাতে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব এবং নাম-যশের উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না! কোরআন পাকে বলা হয়েছে : وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ অন্যত্র বলা হয়েছে : أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ অতএব যে সৎকর্ম রিয়া ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে করা হয়, তা আল্লাহ্র কাছে বাতিল হয়ে যাবে। এমনিভাবে সদকা-খয়রাত সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে :

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى —অর্থাৎ অনুগ্রহের বড়াই করে অথবা গরীবকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের সদকা-খয়রাতকে বাতিল করো না। এতে বোঝা গেল যে, অনুগ্রহের বড়াই করলে অথবা গরীবকে কষ্ট দিলে সদকা বাতিল হয়ে যায়। হযরত হাসান বসরীর উক্তির অর্থ তাই হতে পারে, যা তিনি এই আয়াতের তফসীরে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের সৎ কর্মসমূহকে গোনাহের মাধ্যমে বাতিল করো না। যেমন ইবনে জুরায়েজ বলেন : بالرياء والسمعة মুকাতিল প্রমুখ বলেন : بالمن —কেননা আহলে সুন্নত দলের ঐকমত্যে কুফর ও শিরক ছাড়া কোন কবীরা গোনাহ্ও এমন নেই; যা মু'মিনদের সৎ কর্ম বাতিল করে দেয়। উদাহরণত কেউ চুরি করল এবং সে নিয়মিত নামাযী ও রোযাদার। এমতাবস্থায় তাকে বলা হবে না যে, তোমার নামায রোযা বাতিল হয়ে গেছে—এগুলোর কাযা কর। অতএব, সেসব গোনাহ্ দ্বারাই সৎ কর্ম বাতিল হয়, যেগুলো না করা সৎ কর্ম কবূল হওয়ার জন্য শর্ত, যেমন রিয়া ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে করা। এরূপ উদ্দেশ্যে না করা প্রত্যেক সৎ কর্ম কবূল হওয়ার জন্য শর্ত। এটাও সম্ভবপর যে, হযরত হাসান বসরীর উক্তির অর্থ সৎ কর্মের বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়া হবে এবং স্বয়ং সৎ কর্ম বিনষ্ট হওয়া হবে না। এমতাবস্থায় এটা সকল গোনাহ্র ক্ষেত্রেই শর্ত হবে। যার আমলে গোনাহ্র প্রাধান্য থাকবে, তার অল্প সৎ কর্মেও আযাব থেকে রক্ষা করার মত বরকত থাকবে না; বরং সে নিয়মানুযায়ী গোনাহ্র শাস্তি ভোগ করবে; কিন্তু পরিমাণে ঈমানের বরকতে শাস্তি ভোগার পর মুক্তি পাবে।

আমল বাতিল করার তৃতীয় প্রকার এই যে, কোন সৎ কর্ম শুরু করার পর ইচ্ছাকৃত-ভাবে তা ফাসেদ করে দেওয়া। উদাহরণত নফল নামায অথবা রোযা শুরু করে বিনা ওযরে ইচ্ছাকৃতভাবে তা ফাসেদ করে দেওয়া। এটাও আলোচ্য আয়াতের নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত এবং নাজায়েয। ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মযহাব তাই। তিনি বলেন : যে সৎ কর্ম প্রথমে ফরয অথবা ওয়াজিব ছিল না; কিন্তু কেউ তা শুরু করে দিলে সেই সৎকর্ম পূর্ণ করা আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে ফরয হয়ে যাবে। কেউ এরূপ আমল শুরু করে বিনা ওযরে ছেড়ে দিলে অথবা

ইচ্ছাকৃতভাবে ফাসেদ করে দিলে সে গোনাহ্গার হবে এবং কাযা করাও ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র)-র মতে গোনাহ্গারও হবে না এবং কাযাও করতে হবে না। কারণ, প্রথমে যখন এই আমল ফরয অথবা ওয়াজিব ছিল না, তখন পরেও ফরয ও ওয়াজিব হবে না। কিন্তু হানাফীদের মতে আয়াতের ভাষা ব্যাপক। এতে ফরয, ওয়াজিব, নফল ইত্যাদি সব আমল বিদ্যমান। তফসীরে মাযহারীতে এ স্থানে অনেক হাদীস বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ

এমন শব্দের মাধ্যমেই একটি নির্দেশ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। পুনরুল্লেখের এক কারণ এই যে, প্রথম আয়াতে কাফিরদের পার্থিব ক্ষতি বর্ণিত হয়েছে এবং এই আয়াতে পারলৌকিক ক্ষতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই উদ্ধৃত করা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও হতে পারে যে, প্রথম আয়াতে সাধারণ কাফিরদের বর্ণনা ছিল, যাদের মধ্যে তারাও শামিল ছিল, যারা পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা কাফির অবস্থায় যেমন সৎকর্ম করেছিল, তা সবই নিষ্ফল হয়েছে। মুসলমান হওয়ার পরও সেগুলোর সওয়াব পাবে না। আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে এমন কাফিরদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফর ও শিরককে আঁকড়ে রেখেছিল। তাদের বিধান এই যে, পরকালে কিছুতেই তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ—এ আয়াতে কাফিরদেরকে সন্ধির আহবান জানাতে নিষেধ করা হয়েছে। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে : وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا—অর্থাৎ কাফিররা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তোমরাও ঝুঁকে পড়। এ থেকে সন্ধি করার অনুমতি বোঝা যায়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন যে, অনুমতির আয়াতের অর্থ এই যে, কাফিরদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব হলে তোমরা সন্ধি করতে পার। পক্ষান্তরে এই আয়াতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, উভয় আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু খাঁটি কথা এই যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব করাও জায়েয, যদি এতে মুসলমানদের উপযোগিতা দেখা যায় এবং কাপুরুষতা ও বিলাসপ্রিয়তা এর কারণ না হয়। এ আয়াতের শুরুতে فَلَا تَهِنُوا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাপুরুষতা ও জিহাদ থেকে পলায়নের মনোভাব নিয়ে যে সন্ধি করা হয়, তাই নিষিদ্ধ। কাজেই এতেও কোন বিরোধ নেই। কারণ, وَإِنْ

جَنَحُوا আয়াতের বিধানও তখনই হবে, যখন অলসতা ও কাপুরুষতার কারণে সন্ধি করা না হয়, বরং মুসলমানদের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়।

وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্মসমূহের প্রতিদান হ্রাস করবেন না। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে যে কোন কষ্ট ভোগ কর, তার বিরাট প্রতিদান পরকালে পাবে। অতএব কষ্ট করলেও মু'মিন অকৃতকার্য নয়।

إِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا—সংসারআসক্তিই মানুষের জন্য জিহাদে বাধা-দানকারী হতে পারে। এতে নিজের জীবনের প্রতি আসক্তি, পরিবার-পরিজনের আসক্তি এবং টাকা-কড়ির আসক্তি সবই দাখিল। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব বস্তু সর্বাবস্থায় নিঃশেষ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এগুলোকে আপাতত বাঁচিয়ে রাখলেও অন্য সময় এগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই এসব ধ্বংসশীল ও অস্থায়ী বস্তুর মহব্বতকে পরকালের স্থায়ী অক্ষয় নিয়ামতের মহব্বতের উপর প্রাধান্য দিও না।

وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ—আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ চান না। কিন্তু সমগ্র কোরআনেই যাকাত ও সদকার বিধান এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। স্বয়ং এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার তাকীদ বর্ণিত হচ্ছে। তাই বাহ্যত উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে বলে মনে হয়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন ঃ لَا يَسْأَلْكُمْ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের কাছ থেকে নিজের কোন উপকারের জন্য চান না; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্য চান। এই আয়াতেও

يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ শব্দ দ্বারা এই উপকারের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার জন্য বলার কারণ এই যে, পরকালে তোমরা সওয়াবের প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী হবে। তখন এই ব্যয় তোমাদেরই কাজে লাগবে এবং সেখানে তোমা-দেরকে এর প্রতিদান দেওয়া হবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই বক্তব্যই পেশ করা হয়েছে। এর নজীর হচ্ছে এই আয়াত ঃ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ—অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি তোমাদের কাছে নিজের জন্য কোন জীবনোপকরণ চাই না। আমার এর

প্রয়োজনও নেই। কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই যে, لا يسئلكم বলে সমস্ত ধনসম্পদ চাওয়া বোঝানো হয়েছে। এটা ইবনে উয়ায়নার উক্তি।—(কুরতুবী) পরবর্তী আয়াত এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে, যাতে বলা হয়েছে : يحف-ان يسئلكم فيحفكم শব্দটি احفا = حفا থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাড়াবাড়ি করা এবং কোন কাজে শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। এই আয়াতের মর্ম সবার মতে এই যে, আল্লাহ্ তোমাদের কাছে তোমাদের সমস্ত ধনসম্পদ চাইলে তোমরা কার্পণ্য করতে এবং এই আদেশ পালন তোমাদের কাছে অপ্রিয় মনে হত। এমনকি, আদায় করার সময় মনের এই অপ্রিয় ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ত। সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে لا يسئلكم বলে তাই বোঝানো হয়েছে, যা দ্বিতীয় আয়াতে فيحفكم সংযুক্ত করে বোঝানো হয়েছে। উভয় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি যাকাত, ওশর ইত্যাদি যেসব আর্থিক ফরয কাজ আরোপ করেছেন, প্রথমত সেগুলো স্বয়ং তোমাদেরই উপকারার্থে করেছেন—আল্লাহ্ তা'আলার কোন উপকার নেই। দ্বিতীয়ত আল্লাহ্ তা'আলা এসব ফরয কাজের ক্ষেত্রে করুণাবশত অল্প পরিমাণ অংশই ফরয করেছেন। ফলে একে বোঝা মনে করা উচিত নয়। যাকাতে মজুদ অর্থের ৪০ ভাগের এক ভাগ, উৎপন্ন ফসলের ১০ ভাগের এক অথবা ২০ ভাগের এক, ১০০ ছাগলের মধ্যে একটি ছাগল মাত্র। অতএব বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সমস্ত ধনসম্পদ চান নি। সমস্ত ধনসম্পদ চাইলে তা স্বভাবতই অপ্রিয় ও বোঝা মনে হতে পারত। তাই এই অল্প পরিমাণ অংশ সন্তুষ্টচিত্তে আদায় করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।

ويخرج اضغانكم—اضغان শব্দটি ضغن এর বহুবচন। এর অর্থ গোপন বিদ্বেষ ও গোপন অপ্রিয়তা। এ স্থলেও গোপন অপ্রিয়তা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত ধনসম্পদ ব্যয় করে দেওয়া মানুষের কাছে স্বভাবতই অপ্রিয় ঠেকে, যা সে প্রকাশ করতে না চাইলেও আদায় করার সময় টালবাহানা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ হয়েই পড়ে। আয়াতের সারমর্ম এই যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাছে সমস্ত ধনসম্পদ চাইতেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করতে। কৃপণতার কারণে যে অপ্রিয় ভাব তোমাদের অন্তরে থাকত, তা অবশ্যই প্রকাশ হয়ে পড়ত। তাই তিনি তোমাদের ধনসম্পদের মধ্য থেকে সামান্য একটি অংশ তোমাদের উপর ফরয করেছেন। কিন্তু তোমরা তাতেও কৃপণতা শুরু করেছ। শেষ আয়াতে একথাই এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل—অর্থাৎ তোমাদেরকে

তোমাদের ধনসম্পদের কিছু অংশ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার দাওয়াত দেওয়া হলে তোমাদের কেউ কেউ এতে কৃপণতা করে। এরপর বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ —অর্থাৎ যে ব্যক্তি এতেও কৃপণতা করে, সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করে না; বরং এর মাধ্যমে সে নিজেরই ক্ষতি করে। কারণ, এতে করে সে পরকালের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয় এবং ফরয তরক করার শাস্তির যোগ্য হয়। অতঃপর এই কথাটিই আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاۤءُ —অর্থাৎ আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা মানে স্বয়ং তোমাদের অভাব দূর করা। وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْۤا اَمْثَالَكُمْ

এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের অভাবমুক্ততাকে এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, তোমাদের ধনসম্পদে আল্লাহ্‌ তা'আলার কি প্রয়োজন থাকতে পারে, তিনি তো স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্বেরও মুখাপেক্ষী নন। যদি তোমরা সবাই আমার বিধানাবলী পরিত্যাগ করে বস, তবে যতদিন আমি পৃথিবীকে এবং ইসলামকে বাকী রাখতে চাইব, ততদিন সত্য ধর্মের হিফাযত এবং বিধানাবলী পালন করার জন্য অন্য জাতি সৃষ্টি করব। তারা তোমাদের মত বিধানাবলীর প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না; বরং আমার পুরোপুরি আনুগত্য করবে। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ 'অন্য জাতি বলে অনারব জাতি বোঝানো হয়েছে।' হযরত ইকরামা বলেন ঃ এখানে পারসিক ও রোমক জাতি বোঝানো হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন সাহাবায়ে-কিরামের সামনে এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন, তখন তাঁরা আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্‌ ! (সা) তাঁরা কোন্‌ জাতি, যাদেরকে আমাদের স্থলে আনা হবে, অতঃপর তাঁরা আমাদের মত শরীয়তের বিধানাবলীর প্রতি বিমুখ হবে না? রসূলুল্লাহ্‌ (সা) মজলিসে উপস্থিত হযরত সালমান ফারসী (রা)-র উরুতে হাত মেরে বললেন ঃ সে এবং তাঁর জাতি। যদি সত্য ধর্ম সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্রেও থাকত, ( যেখানে মানুষ পৌঁছতে পারে না ) তবে পারস্যের কিছু সংখ্যক লোক সেখানেও পৌঁছে সত্য ধর্ম হাসিল করত এবং তা মেনে চলত।—( তিরমিযী, হাকেম, মাযহারী )

শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী ইমাম আবূ হানীফা (র)-র প্রশংসায় লিখিত গ্রন্থে বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁর সহচরদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা তাঁরা পারস্য সন্তান। কোন দলই জ্ঞানের সেই স্তরে পৌঁছেনি, যেখানে আবূ হানীফা (র) ও তাঁর সহচরগণ পৌঁছেছেন।—( তফসীরে-মাযহারীর প্রান্ত-টীকা )

———————